International Journal of Multidisciplinary Horizon

ISSN: **3049-2017**
IJMH 2026; 3(3): 20-23
© 2026 IJMH
www.themultijournal.com

Received: 14-04-2026
Accepted: 02-05-2026
Publish : 04-05-2026

রাকা রায় চৌধুরী
বাংলা বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

Correspondence:
Raka Roy Choudhury
Department Of Bengali,
University Of Kalyani

পৌরাণিক চরিত্র "জনা"-র বিনির্মাণ

মধুসূদনের 'জনা' ও গিরিশচন্দ্রের 'জনা': একটি তুলনামূলক সমালোচনামূলক গবেষণা

রাকা রায় চৌধুরী

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20095446

Abstract

বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক চরিত্রের পুনর্নির্মাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক প্রবণতা, যার মাধ্যমে অতীতের চরিত্রসমূহকে সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। "জনা" চরিত্রটি সেই ধরনের এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ, যা সীমিত পৌরাণিক সূত্র থেকে উদ্ভূত হলেও আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর কাব্যে জনাকে এক শক্তিশালী, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও প্রতিবাদী নারীরূপে নির্মাণ করেছেন, যেখানে নবজাগরণ যুগের প্রগতিশীল চিন্তা ও নারীস্বাধীনতার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। অপরদিকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর নাটকে জনাকে ঐতিহ্যনিষ্ঠ, আবেগপ্রবণ ও কর্তব্যপরায়ণ নারীরূপে উপস্থাপন করেছেন, যা নাট্যরস সৃষ্টিতে সহায়ক এবং সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে। এই প্রবন্ধে পাঠ বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে উভয় সাহিত্যিকের রচনায় জনা চরিত্রের গঠন, বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণাটি দেখায় যে, একই পৌরাণিক চরিত্র ভিন্ন সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যুগচেতনার প্রভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে। ফলে "জনা" কেবল একটি চরিত্র নয়, বরং বাংলা সাহিত্যে নারীচেতনা, সমাজভাবনা ও সাহিত্যিক সৃজনশীলতার পরিবর্তনশীলতার একটি প্রতীক।

Keywords/মূল শব্দ: জনা, মধুসূদন দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, চরিত্র বিনির্মাণ, বাংলা সাহিত্য, নারীবাদ, নাট্যরূপ।

১. ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রের পুনর্নির্মাণ এক গভীর ও বহুমাত্রিক সাহিত্যিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে অতীতের কাহিনি ও চরিত্রগুলি নতুন সময়, সমাজ ও চিন্তার আলোকে পুনরায় ব্যাখ্যাত হয়। এই পুনর্নির্মাণ কেবলমাত্র প্রাচীন কাহিনির পুনরুক্তি নয়, বরং তা এক ধরনের সৃজনশীল রূপান্তর, যেখানে সাহিত্যিক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, যুগচেতনা ও সামাজিক অভিজ্ঞতার আলোকে চরিত্রগুলিকে নতুন অর্থ ও তাৎপর্য প্রদান করেন। উনবিংশ শতকের বাংলা নবজাগরণ এই প্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে ত্বরান্বিত করে, কারণ এই সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা, যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ধারণা বাংলা সমাজে প্রবেশ করতে শুরু করে। ফলে সাহিত্যেও এক নতুন চেতনার উদ্ভব ঘটে, যা পুরনো পৌরাণিক কাঠামোর মধ্যে আধুনিক ভাবনা ও মূল্যবোধকে সংযোজিত করে। এই প্রেক্ষাপটে "জনা" চরিত্রটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। মহাভারতীয় বা পৌরাণিক সূত্রে জনার উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে সীমিত ও অস্পষ্ট, ফলে এই চরিত্রটি সাহিত্যিক কল্পনার জন্য একটি উন্মুক্ত ক্ষেত্র তৈরি করে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ, যিনি বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যরীতি ও আধুনিক ভাবধারার সমন্বয় ঘটিয়ে এক নতুন যুগের সূচনা করেন। তাঁর রচনায় নারীচরিত্রগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি তাঁদের কেবল পার্শ্বচরিত্র হিসেবে নয়, বরং স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ও শক্তিশালী সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর 'জনা' চরিত্রে আমরা দেখতে পাই এক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, প্রতিবাদী ও সচেতন নারীর প্রতিচ্ছবি, যিনি সমাজের প্রচলিত নিয়ম ও সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি নবজাগরণের প্রগতিশীল চিন্তারই প্রতিফলন, যেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও নারীর মর্যাদা বিশেষ গুরুত্ব পায়। অন্যদিকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাংলা নাট্যসাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, যিনি মঞ্চনির্ভর নাট্যরস সৃষ্টিতে অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর রচনায় পৌরাণিক চরিত্রগুলি প্রায়শই নাটকীয় আবেগ, নৈতিক দ্বন্দ্ব ও সামাজিক মূল্যবোধের বাহক হিসেবে উপস্থিত হয়। গিরিশচন্দ্রের 'জনা' চরিত্রে আমরা দেখতে পাই এক সংযত, কর্তব্যপরায়ণ ও আবেগপ্রবণ নারীরূপ, যিনি সমাজের প্রচলিত আদর্শ ও মূল্যবোধকে ধারণ করেন। তাঁর এই উপস্থাপনায় নাট্যরসের

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হলো:

- জনা চরিত্রের পৌরাণিক উৎস নির্ণয় করা
- উভয় রূপের তুলনামূলক আলোচনা করা

৩. গবেষণার পদ্ধতি (Research Methodology)

এই গবেষণায় মূলত গুণগত (qualitative) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

- পাঠ বিশ্লেষণ (Textual Analysis): মধুসূদন ও গিরিশচন্দ্রের মূল রচনাগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method): দুই লেখকের চরিত্র নির্মাণের ধরণ তুলনা করা হয়েছে।
- ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Approach): নবজাগরণ যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা হয়েছে।

৪. জনা চরিত্রের পৌরাণিক উৎস

"জনা" চরিত্রটি মহাভারতীয় কাহিনির সঙ্গে সম্পর্কিত বলে বিবেচিত হয়। যদিও মূল গ্রন্থে তার উপস্থিতি সীমিত, তবুও এই সীমাবদ্ধতাই সাহিত্যিকদের কল্পনার স্বাধীনতা দিয়েছে। ফলে জনা চরিত্রটি নির্দিষ্ট পৌরাণিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে একটি প্রতীকী চরিত্রে পরিণত হয়েছে।একটি আধুনিক, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও প্রতিবাদী নারীচরিত্র, যা বাংলা সাহিত্যে নারীচেতনার বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। তাঁর এই চরিত্র নির্মাণ কেবল সাহিত্যিক সৃষ্টিশীলতার নিদর্শন নয়, বরং নবজাগরণ যুগের প্রগতিশীল মানসিকতারও এক শক্তিশালী প্রতিফলন। এই চরিত্র নির্মাণে নবজাগরণের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

৫. মধুসূদনের 'জনা': একটি বিশ্লেষণ

বাংলা নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে কাব্যধারা নির্মাণ করেন, তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে আধুনিক মানসিকতা ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পুনর্গঠন। তাঁর সৃষ্ট "জনা" চরিত্র এই পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়ার এক উজ্জ্বল উদাহরণ, যেখানে প্রাচীন কাহিনির সীমিত ইঙ্গিতকে ভিত্তি করে তিনি এক সম্পূর্ণ নতুন, শক্তিশালী এবং আত্মসচেতন নারীর প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করেছেন। মধুসূদনের 'জনা' মূলত একটি বীরাঙ্গনা চরিত্র, কিন্তু এই বীরত্ব কেবল বাহ্যিক নয়, বরং তা মানসিক ও নৈতিক দৃঢ়তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। তিনি প্রচলিত নারীচরিত্রের মতো নীরব, অনুগত বা আত্মবিসর্জনপ্রবণ নন; বরং নিজের সম্মান ও অবস্থান সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। তাঁর চরিত্রে আত্মমর্যাদাবোধ প্রবল, এবং সেই কারণে তিনি অন্যায় বা অবমাননাকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে প্রস্তুত নন।

৫.১ নারীস্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত–এর সৃষ্ট 'জনা' চরিত্রে নারীস্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদার যে শক্তিশালী প্রকাশ লক্ষ করা যায়, তা বাংলা সাহিত্যে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচক। উনবিংশ শতকের সমাজব্যবস্থায় নারীরা প্রধানত পুরুষতান্ত্রিক নিয়মের অধীনস্থ ছিল, যেখানে তাদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ ছিল পরিবার ও গৃহস্থালির মধ্যে। এই প্রেক্ষাপটে মধুসূদনের 'জনা' এক সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র তুলে ধরে—তিনি নিছক অনুগত বা আত্মবিসর্জনকারী নারী নন, বরং নিজের সত্তা, মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন এক ব্যক্তিত্ব। 'জনা'-র আত্মমর্যাদাবোধ তার চরিত্রের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি নিজের সম্মানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন এবং কোনো প্রকার অবমাননা বা অন্যায়ের সামনে নতিস্বীকার করতে রাজি নন। এই অবস্থান কেবল ব্যক্তিগত অহংবোধ নয়, বরং এক নৈতিক দৃঢ়তা, যা তাকে সাহসী ও প্রতিবাদী করে তোলে।

৫.২ বীরত্ব ও দৃঢ়তা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত–এর সৃষ্ট 'জনা' চরিত্রে বীরত্ব ও দৃঢ়তা এমনভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে, যা তাকে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য নারীচরিত্র থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রদান করে। এখানে বীরত্ব কেবল যুদ্ধক্ষেত্রের সাহসিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা মানসিক শক্তি, নৈতিক স্থিরতা এবং আত্মসম্মান রক্ষার অদম্য সংকল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। জনা এমন এক চরিত্র, যিনি প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েও ভেঙে পড়েন না; বরং নিজের অবস্থানে অটল থেকে পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। এই বীরত্বের মূল উৎস তার অন্তর্নিহিত আত্মবিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতি দৃঢ় আনুগত্য।

৫.৩ মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত–এর সৃষ্ট 'জনা' চরিত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তার মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা, যা তাকে কেবল একটি বীরাঙ্গনা বা প্রতীকী চরিত্রের গণ্ডি থেকে বের করে এক জীবন্ত, জটিল ও বহুমাত্রিক মানবসত্তায় পরিণত করেছে। মধুসূদন জনার অন্তর্জগতকে যে সূক্ষ্মতা ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন, তা বাংলা সাহিত্যে আধুনিক চরিত্র নির্মাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। জনা'র মনস্তত্ত্বের কেন্দ্রে রয়েছে তার অন্তর্দ্বন্দ্ব—ব্যক্তিগত আবেগ, সামাজিক প্রত্যাশা এবং নৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে এক অবিরাম সংঘাত।

৫.৪ নবজাগরণ প্রভাব

বাংলা নবজাগরণ ছিল এক গভীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক পরিবর্তনের যুগ, যার প্রভাব সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। এই সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা, যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ধারণা বাংলা সমাজে প্রবেশ করে, যা প্রচলিত রীতিনীতি ও চিন্তাধারাকে নতুনভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই নবজাগরণ ভাবধারার অন্যতম প্রধান ধারক, এবং তাঁর রচনায় এই প্রভাব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর সৃষ্ট 'জনা' চরিত্রে নবজাগরণের এই প্রগতিশীল চেতনার একটি উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। মধুসূদনের 'জনা' চরিত্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যে জোরালো উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তা নবজাগরণের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। তিনি সমাজের প্রচলিত নিয়ম ও মূল্যবোধকে অন্ধভাবে মেনে নেন না; বরং নিজস্ব বিচারবুদ্ধি ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

৬. গিরিশচন্দ্রের 'জনা': একটি বিশ্লেষণ

বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিকাশে গিরিশচন্দ্র ঘোষ যে অবদান রেখেছেন, তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রকে মঞ্চোপযোগী নাট্যরূপে রূপান্তর করা। তাঁর সৃষ্ট 'জনা' চরিত্র এই নাট্যরূপায়ণের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন, যেখানে চরিত্রটি কেবল কাহিনির ধারক নয়, বরং আবেগ, নৈতিকতা ও নাট্যসংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে উঠেছে। গিরিশচন্দ্রের 'জনা' চরিত্রে প্রথমেই যে দিকটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তা হলো তার ঐতিহ্যনিষ্ঠ ও সমাজসংলগ্ন প্রকৃতি। তিনি সমাজের প্রচলিত নিয়ম, পারিবারিক দায়িত্ব এবং নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই চরিত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার চেয়ে কর্তব্যবোধ ও সামাজিক আদর্শ বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। ফলে জনা এক আদর্শ নারীচরিত্র হিসেবে প্রতিভাত হন, যিনি আত্মত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজের অবস্থানকে অর্থবহ করে তোলেন।

৬.১ ঐতিহ্যনিষ্ঠ নারীচরিত্র

গিরিশচন্দ্র ঘোষ–এর সৃষ্ট 'জনা' চরিত্রে ঐতিহ্যনিষ্ঠ নারীচরিত্রের যে রূপায়ণ দেখা যায়, তা উনবিংশ শতকের বাংলা সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ ও নৈতিক আদর্শের এক সুস্পষ্ট প্রতিফলন। এই জনা আধুনিক অর্থে বিদ্রোহী বা আত্মকেন্দ্রিক নন; বরং তিনি সামাজিক নিয়ম, পারিবারিক কর্তব্য এবং নৈতিকতার প্রতি গভীরভাবে অনুগত এক সত্তা, যার জীবনচর্যা মূলত দায়িত্ববোধ ও শৃঙ্খলার দ্বারা পরিচালিত।

এই চরিত্রের মূল ভিত্তি হলো কর্তব্যপরায়ণতা। জনা নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতি বা আকাঙ্ক্ষার চেয়ে পরিবার ও সমাজের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেন। তিনি সম্পর্কের প্রতি বিশ্বস্ত, দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান এবং সামাজিক আদর্শ রক্ষায় সচেষ্ট। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাকে এক আদর্শ গৃহিণী ও নৈতিকভাবে দৃঢ় নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে, যা তৎকালীন সমাজে নারীর কাম্য গুণ হিসেবে বিবেচিত হতো।

ঐতিহ্যনিষ্ঠতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সহিষ্ণুতা ও আত্মসংযম, যা জনার চরিত্রে গভীরভাবে প্রতিফলিত। তিনি দুঃখ, বেদনা বা অপমানের সম্মুখীন হলেও তা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করেন এবং সহজে ভেঙে পড়েন না। এই সহিষ্ণুতা কোনো নিষ্ক্রিয়তার চিহ্ন নয়;

বরং এটি এক ধরনের নৈতিক শক্তি, যা তাকে স্থিতিশীল ও মর্যাদাবান করে তোলে। তিনি আবেগপ্রবণ হলেও সেই আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে জানেন এবং পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজেকে পরিচালিত করেন।

৬.২ আবেগপ্রবণতা

গিরিশচন্দ্র ঘোষ–এর সৃষ্ট 'জনা' চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তার তীব্র আবেগপ্রবণতা, যা নাট্যরস সৃষ্টির কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে কাজ করে। গিরিশচন্দ্র নাট্যকার হিসেবে খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, মঞ্চে দর্শকের সঙ্গে দ্রুত ও গভীর সংযোগ স্থাপনের জন্য আবেগের প্রত্যক্ষ ও শক্তিশালী প্রকাশ অপরিহার্য। সেই কারণে তাঁর জনা চরিত্রে আবেগের প্রবাহ উন্মুক্ত, তীব্র এবং বহুমাত্রিক।

এই আবেগপ্রবণতা জনার চরিত্রকে একদিকে যেমন মানবিক করে তোলে, অন্যদিকে তেমনি তাকে নাটকীয়তার এক উচ্চমাত্রায় উন্নীত করে। তিনি ভালোবাসা, বেদনা, হতাশা, আনন্দ কিংবা শোক—প্রতিটি অনুভূতিকে গভীরভাবে অনুভব করেন এবং তা সংলাপ ও আচরণের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। তার আবেগ কখনো সংযত নয়; বরং তা দর্শকের অনুভূতিকে সরাসরি স্পর্শ করার জন্য উন্মোচিত। এই উন্মুক্ত আবেগপ্রকাশ নাটকের দৃশ্যগুলোকে প্রাণবন্ত করে তোলে এবং কাহিনির গতি ও উত্তেজনাকে তীব্র করে।

গিরিশচন্দ্রের 'জনা'-র আবেগপ্রবণতা কেবল ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ নয়; এর মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধও নিহিত থাকে। তার ভালোবাসা যেমন নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধে পূর্ণ, তেমনি তার বেদনা বা দুঃখও নৈতিক দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত। ফলে তার আবেগ কেবল তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া নয়, বরং গভীর মানবিক ও সামাজিক তাৎপর্য বহন করে।

৬.৩ পারিবারিক মূল্যবোধ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ–এর সৃষ্ট 'জনা' চরিত্রে পারিবারিক মূল্যবোধ একটি কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে, যা তার চরিত্র নির্মাণের মূল ভিত্তিকে দৃঢ় করে। জনা এখানে কেবল একজন ব্যক্তি নয়; বরং তিনি পরিবার ও সামাজিক কাঠামোর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, যার জীবনচর্যা, সিদ্ধান্ত এবং মানসিকতা মূলত পারিবারিক দায়িত্ব ও সম্পর্কের প্রতি গভীর আনুগত্যের দ্বারা পরিচালিত। এই চরিত্রে পারিবারিক দায়িত্ববোধ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। জনা নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা বা আবেগকে অনেক সময় পরিবারের কল্যাণ ও সম্মানের জন্য বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। তিনি বিশ্বাস করেন যে পরিবারের স্থিতিশীলতা ও মর্যাদা রক্ষা করা তার অন্যতম প্রধান কর্তব্য। জনা'র চরিত্রে পারিবারিক সম্পর্কের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়। তিনি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আবেগগতভাবে নিবিড়ভাবে যুক্ত এবং তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। তার ভালোবাসা ও যত্ন নিছক আবেগপ্রবণ নয়; বরং তা দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যনিষ্ঠার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই সম্পর্কের বন্ধনই তাকে মানসিকভাবে দৃঢ় রাখে এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাকে এগিয়ে চলার শক্তি জোগায়।

এছাড়া, জনা পারিবারিক মূল্যবোধকে কেবল ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন না; বরং তা সমাজের বৃহত্তর নৈতিক কাঠামোর অংশ হিসেবে বিবেচনা করেন।

৬.৪ নাট্যধর্মী উপস্থাপনা

গিরিশচন্দ্র ঘোষ–এর সৃষ্ট 'জনা' চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তার নাট্যধর্মী উপস্থাপনা, যা চরিত্রটিকে কেবল সাহিত্যিক বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে জীবন্ত মঞ্চ-অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করে। গিরিশচন্দ্র মূলত একজন সফল নাট্যকার ও মঞ্চসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব হওয়ায় তাঁর চরিত্র নির্মাণে অভিনয়যোগ্যতা, সংলাপের প্রভাব এবং দৃশ্যগত আকর্ষণ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। 'জনা' চরিত্রে এই নাট্যধর্মিতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত।

প্রথমত, জনার সংলাপগুলি নাটকীয়, আবেগঘন এবং সরাসরি দর্শকের অনুভূতিকে স্পর্শ করার মতো করে নির্মিত। তার কথোপকথনে আবেগের তীব্রতা, ভাষার শক্তি এবং প্রকাশভঙ্গির নাটকীয়তা এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে, যা মঞ্চে উচ্চারণের সময় গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এই সংলাপভিত্তিক নির্মাণ চরিত্রটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে এবং নাটকের ঘটনাপ্রবাহকে গতিশীল রাখে।

দ্বিতীয়ত, চরিত্রটির অঙ্গভঙ্গি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং আবেগপ্রকাশ মঞ্চোপযোগীভাবে পরিকল্পিত। জনার প্রতিটি অনুভূতি—দুঃখ, প্রেম, হতাশা বা আশা—এমনভাবে উপস্থাপিত হয়, যা দর্শকের সামনে দৃশ্যমান ও অনুভবযোগ্য হয়ে ওঠে। তার আবেগের ওঠানামা নাটকের দৃশ্যগুলিকে আরও তীব্র ও আকর্ষণীয় করে তোলে, ফলে দর্শক সহজেই কাহিনির সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারে।

তৃতীয়ত, নাট্যসংঘাত সৃষ্টিতে জনা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তার সিদ্ধান্ত, আবেগ এবং প্রতিক্রিয়াগুলি কাহিনির দ্বন্দ্বকে তীব্র করে এবং নাটকের নাটকীয় উত্তেজনা বৃদ্ধি করে। এইভাবে 'জনা' কেবল একটি চরিত্র নয়, বরং নাটকের গতিশীল শক্তি, যা কাহিনির অগ্রগতি ও নাট্যরস সৃষ্টিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

৭. তুলনামূলক বিশ্লেষণ

পৌরাণিক "জনা" চরিত্রটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ–এর রচনায় দুই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্মিত হয়েছে, যা বাংলা সাহিত্যে চরিত্র বিনির্মাণের বহুমাত্রিকতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। এই দুই সাহিত্যিকের 'জনা' চরিত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণে তাদের সাহিত্যিক উদ্দেশ্য, যুগচেতনা এবং শিল্পরীতির পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথমত, নারীচেতনার দিক থেকে এই দুই 'জনা' সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। মধুসূদনের জনা আধুনিক, আত্মসচেতন এবং প্রতিবাদী নারীর প্রতীক, যেখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদা প্রধান। তিনি সমাজের প্রচলিত নিয়মকে প্রশ্ন করতে দ্বিধা করেন না এবং নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন। অন্যদিকে গিরিশচন্দ্রের জনা ঐতিহ্যনিষ্ঠ, সংযত এবং কর্তব্যপরায়ণ, যেখানে সামাজিক নিয়ম ও পারিবারিক মূল্যবোধকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এখানে নারীচরিত্রটি বিদ্রোহী নয়, বরং সহিষ্ণু ও অনুগত।

দ্বিতীয়ত, চরিত্র নির্মাণের ধরণে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়। মধুসূদনের 'জনা' মনস্তাত্ত্বিকভাবে গভীর, অন্তর্মুখী এবং বিশ্লেষণধর্মী; তার চিন্তা, দ্বন্দ্ব ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া পাঠকের সামনে সূক্ষ্মভাবে উন্মোচিত হয়। অপরদিকে গিরিশচন্দ্রের 'জনা' বহির্মুখী, নাট্যধর্মী এবং আবেগনির্ভর; তার অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া সরাসরি প্রকাশিত হয়, যা দর্শকের আবেগকে দ্রুত স্পর্শ করে।

তৃতীয়ত, আবেগপ্রকাশের ক্ষেত্রে এই দুই চরিত্রের ভিন্নতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মধুসূদনের জনার আবেগ সংযত, গভীর এবং যুক্তিনির্ভর; তার অনুভূতি নিয়ন্ত্রিত এবং আত্মমর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিপরীতে গিরিশচন্দ্রের জনার আবেগ উন্মুক্ত, তীব্র এবং নাটকীয়; তার অনুভূতির প্রকাশ সরাসরি এবং দর্শকপ্রভাবিত।

৭.১ নারীচেতনার পার্থক্য

"জনা" চরিত্রকে কেন্দ্র করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ–এর সৃষ্টিতে নারীচেতনার যে পার্থক্য প্রতিফলিত হয়েছে, তা বাংলা সাহিত্যের ভাবগত পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ করে। এই পার্থক্য কেবল চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে নয়, বরং নারী সম্পর্কে সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজভাবনার গভীর পরিবর্তনকেও চিহ্নিত করে। মধুসূদনের 'জনা' আধুনিক নারীচেতনার প্রতীক, যেখানে নারীকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে দেখা হয়েছে। তিনি নিজের চিন্তা, অনুভূতি ও সিদ্ধান্তের অধিকারী এবং সেই অধিকার প্রয়োগে দৃঢ়। তার আত্মমর্যাদাবোধ প্রবল, এবং তিনি কোনো অবস্থাতেই নিজের সম্মান বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নন। অপরদিকে, গিরিশচন্দ্রের 'জনা' ঐতিহ্যগত নারীচেতনার প্রতিনিধিত্ব করে, যেখানে নারীর পরিচয় মূলত পরিবার, সম্পর্ক এবং সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। তিনি কর্তব্যপরায়ণ, সহিষ্ণু এবং আনুগত্যশীল—এই গুণাবলির মাধ্যমে তিনি এক আদর্শ নারীচরিত্র হিসেবে প্রতিভাত হন। তার ব্যক্তিসত্তা থাকলেও তা সামাজিক কাঠামোর বাইরে নয়; বরং সেই কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং, নারীচেতনার এই পার্থক্য কেবল দুটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতা নয়; বরং তা বাংলা সমাজে নারী সম্পর্কে ধারণার বিবর্তনের একটি সাহিত্যিক প্রতিফলন। মধুসূদনের 'জনা'

যেখানে পরিবর্তন ও স্বাধীনতার প্রতীক, সেখানে গিরিশচন্দ্রের ‘জনা’ স্থিতিশীলতা ও ঐতিহ্যের ধারক—এই দ্বৈততা বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যকে আরও সুস্পষ্ট করে তোলে।

৭.২ চরিত্রের গঠন

“জনা” চরিত্রের গঠন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ–এর রচনায় এই চরিত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন শিল্পরীতি, উদ্দেশ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে নির্মিত হয়েছে। এই পার্থক্য কেবল বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে নয়, বরং চরিত্রের অন্তর্গত গঠন, মনস্তত্ত্ব এবং উপস্থাপনার ধরণেও গভীরভাবে প্রতিফলিত। মধুসূদনের ‘জনা’ চরিত্রের গঠন মূলত মনস্তাত্ত্বিক ও অন্তমুখী। তিনি চরিত্রটিকে কেবল ঘটনাপ্রবাহের অংশ হিসেবে উপস্থাপন করেননি; বরং তার অন্তর্জগত, ভাবনা, দ্বন্দ্ব ও আবেগের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ মানবিক সত্তা হিসেবে গড়ে তুলেছেন। জনার প্রতিটি সিদ্ধান্ত তার ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, আত্মমর্যাদা এবং যুক্তিবোধের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এই কারণে তার চরিত্র ধাপে ধাপে বিকশিত হয় এবং পাঠকের কাছে এক জীবন্ত, বাস্তব ও জটিল ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিভাত হয়।

৭.৩ সামাজিক প্রভাব

“জনা” চরিত্রের মাধ্যমে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ—উভয়েই তাঁদের সময়ের সমাজচিন্তা, নৈতিকতা এবং মূল্যবোধকে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিফলিত করেছেন। ফলে এই দুই ‘জনা’ কেবল সাহিত্যিক চরিত্র নয়; তারা সমাজের পরিবর্তন ও স্থিতিশীলতার দুই ভিন্ন ধারার প্রতীক হয়ে ওঠে। মধুসূদনের ‘জনা’ চরিত্রের সামাজিক প্রভাব মূলত প্রগতিশীল। উনবিংশ শতকের নবজাগরণ পর্বে যখন নারীশিক্ষা, নারীস্বাধীনতা এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ধারণা সমাজে ক্রমশ গুরুত্ব পাচ্ছিল, তখন তাঁর ‘জনা’ সেই পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী প্রতিচ্ছবি হিসেবে আবির্ভূত হয়। তিনি নারীর আত্মমর্যাদা, অধিকারবোধ এবং প্রতিবাদী সত্তাকে সামনে নিয়ে আসেন, যা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি নীরব কিন্তু দৃঢ় চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। এই চরিত্র পাঠককে নতুনভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে—নারী কেবল গৃহবন্দী নয়, বরং একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, যার নিজস্ব ইচ্ছা ও মতামত রয়েছে। ফলে মধুসূদনের ‘জনা’ সমাজসংস্কারের এক অনুপ্রেরণামূলক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

৮. আলোচনা (Discussion)

পৌরাণিক “জনা” চরিত্রের পুনর্নির্মাণকে কেন্দ্র করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ–এর রচনায় যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, তা কেবল দুটি পৃথক সাহিত্যিক রীতির পার্থক্য নয়; বরং এটি বাংলা সমাজের মানসিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত পরিবর্তনের একটি গভীর প্রতিফলন। এই আলোচনায় স্পষ্ট হয় যে, চরিত্র বিনির্মাণ একটি স্থির প্রক্রিয়া নয়—এটি সময়, সমাজ ও সাহিত্যিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। মধুসূদনের ‘জনা’ চরিত্রে যে আধুনিকতা, আত্মমর্যাদা ও প্রতিবাদী চেতনা প্রকাশ পেয়েছে, তা নবজাগরণের উদীয়মান প্রগতিশীল সমাজচিন্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তিনি নারীকে একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে কল্পনা করেছেন, যা তৎকালীন সমাজব্যবস্থার জন্য ছিল এক নতুন ধারণা। এই দৃষ্টিভঙ্গি কেবল সাহিত্যিক কল্পনার ফল নয়; বরং এটি সমাজে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনার প্রতিফলন। তাঁর ‘জনা’ চরিত্র পাঠককে ভাবতে শেখায়, প্রশ্ন তুলতে উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানায়।

অন্যদিকে, গিরিশচন্দ্রের ‘জনা’ চরিত্রে যে ঐতিহ্যনিষ্ঠতা, আবেগপ্রবণতা ও পারিবারিক মূল্যবোধের প্রতি আনুগত্য দেখা যায়, তা সমাজের স্থিতিশীলতা রক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ করে। তাঁর নাট্যরূপায়ণে জনা এমন এক আদর্শ নারীচরিত্র, যিনি সমাজের প্রচলিত নৈতিক কাঠামোকে অটুট রাখেন। এই উপস্থাপনায় কোনো প্রতিবাদী সুর নেই; বরং রয়েছে সমন্বয়, সহিষ্ণুতা এবং দায়িত্ববোধের উপর জোর। ফলে তাঁর ‘জনা’ সমাজের পরিবর্তনের চেয়ে ধারাবাহিকতা ও শৃঙ্খলার প্রতীক হয়ে ওঠে।

৯. উপসংহার

পৌরাণিক চরিত্র “জনা”-র পুনর্নির্মাণ বাংলা সাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক প্রবণতার দৃষ্টান্ত, যেখানে একই উৎস থেকে উদ্ভূত চরিত্র ভিন্ন সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যুগচেতনার প্রভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ ও তাৎপর্য অর্জন করে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ—এই দুই সাহিত্যিকের রচনায় ‘জনা’ চরিত্রের রূপায়ণ সেই বৈচিত্র্যেরই উজ্জ্বল উদাহরণ। মধুসূদনের ‘জনা’ আধুনিকতা, আত্মমর্যাদা, স্বাধীনতা এবং প্রতিবাদী চেতনার প্রতীক। তাঁর চরিত্র নির্মাণে নবজাগরণের প্রগতিশীল চিন্তা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এবং নারীস্বাধীনতার ধারণা গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই জনা কেবল একটি সাহিত্যিক চরিত্র নয়; বরং সমাজে পরিবর্তনের আহ্বান জানানো এক শক্তিশালী কণ্ঠস্বর। অন্যদিকে গিরিশচন্দ্রের ‘জনা’ ঐতিহ্য, পারিবারিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং আবেগপ্রবণতার সমন্বয়ে গঠিত এক সংযত ও কর্তব্যপরায়ণ নারীচরিত্র। তাঁর উপস্থাপনায় সমাজের প্রচলিত আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সেই কাঠামোর মধ্যে নারীর ভূমিকার একটি সুসংহত চিত্র ফুটে ওঠে। এই দুই ভিন্ন রূপায়ণ বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে, চরিত্র বিনির্মাণ কেবল সাহিত্যিক কল্পনার বিষয় নয়; বরং তা সমাজ, ইতিহাস এবং সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। মধুসূদনের ‘জনা’ যেখানে পরিবর্তন, প্রশ্ন এবং স্বাধীনতার প্রতীক, সেখানে গিরিশচন্দ্রের ‘জনা’ স্থিতিশীলতা, সংযম এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের প্রতিফলন। এই দ্বৈততা বাংলা সাহিত্যের অন্তর্নিহিত বহুমাত্রিকতা এবং চিন্তার বৈচিত্র্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। অতএব, “জনা” চরিত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণ আমাদের সামনে একটি বৃহত্তর সত্য উন্মোচন করে—সাহিত্য কখনো স্থির নয়; এটি সময়, সমাজ ও মানবচিন্তার সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। একই চরিত্র বিভিন্ন সময়ে নতুন অর্থ ধারণ করে এবং সেই পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সাহিত্য তার প্রাণশক্তি ও প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখে।

১০. তথ্যসূত্র (APA 7th Edition)

- মাইকেল মধুসূদন দত্ত। (১৮৬২)। বীরাঙ্গনা কাব্য। কলকাতা: প্রাচীন প্রকাশনী।
- গিরিশচন্দ্র ঘোষ। (১৮৮০)। জনা নাটক। কলকাতা: নাট্যপ্রকাশ।
- সেন, সুকুমার। (২০০৫)। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
- মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র। (২০১০)। বাংলা নাট্যসাহিত্য ও থিয়েটার। কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং।
- চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ। (২০১৫)। বাংলা নবজাগরণ ও সাহিত্যচেতনা। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।
- ভট্টাচার্য, অশোক। (২০১২)। উনবিংশ শতকের বাংলা সমাজ ও সাহিত্য। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।